ISSN 1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দশম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১২/নভেম্বর ২০০৫

পরিবেশগত সমস্যা ও টেকসই উন্নয়ন ধারণা এবং পরিপ্রেক্ষিত

মোঃ নুরুল আমিন*

Abstract: *Sound environment, co-existence between natural and social elements, is inevitable for the sustainability of humankind. Growth-centric and short-sighted development activities creat various environmental problems viz., greenhouse effect, overpopulation, global warming, acid rain, ozone detraction, deforestation, radiation, soil erosion, air pollution, water pollution, sound pollution etc. As a result, interrogation of environmental issues in development practices that is sustainable development is a must to meet the needs of present generation as well as future. Obviously, environment is a global issue. But, at present, environment- friendly development is very much important in developing countries than developed countries. By this time, most of the developing countries are going to use their natural resources for the people's socio-economic development by the techno-economical assistance of industrialist countries. In that case, developing countries have potentials to consider negative environment effects in development initiatives, which make their present as well as future live sustainable. So, sound conceptual understanding and consensus on livable environment vis-à-vis sustainable development is necessary among government, private sector and civil society both in developed and developing nations.*

ভূমিকা

মানুষের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পৃথিবীর বাস্তুসংস্থান ও জীব বৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়নের (sustainable development) ধারণাটি উন্নয়ন তত্ত্ব ও চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষকগণের মাঝে একটি দৃঢ় মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিবেশগত বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। অথচ শিল্পোন্নত বিশ্বের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের সাহায্য দাতা গোষ্ঠীর নির্দেশিত নির্ভরশীল উন্নয়ন তত্ত্বে যুগ যুগ ধরে পরিবেশের ইস্যুটি ছিল উপেক্ষিত। উন্নয়নের উপরোক্ত সনাতনী ধারণার সম্পূর্ণ বিপক্ষে নয় বরং সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে পরিবেশের প্রতি সহনশীল উন্নয়নের তত্ত্ব হিসেবে টেকসই বা ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণাটির জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান পর্যালোচনায় প্রথমে পরিবেশ ধারণাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বিশ্বের সাধারণ পরিবেশগত সমস্যাসমূহের ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর টেকসই উন্নয়ন ধারণার পরিপ্রেক্ষিত অর্থ ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

পরিবেশের ধারণা

সাধারণভাবে পরিবেশ (environment) বলতে আমাদের যা কিছু বেষ্টন করে আছে তাকে বোঝায়। গাছপালা, নদীনালা, বাতাস, পানি, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়াদি যেমন পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত তেমনি পরিবার, কমিউনিটি, নগর, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ পৃথিবীর বুকে জীবসত্তা অথবা সমগ্রকের (population) ওপর প্রভাব বিস্তারকারী জীব ও জড় বিষয়াদি নিয়ে পরিবেশ গঠিত। ডেভিড ডি কেম্প বলেন, পরিবেশ বিভিন্ন ভৌত এবং জৈবিক উপাদানের একটি সমন্বয় যা কোন জীবসত্তার জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে (a combination of the various physical and biological elements that affect the life of an organism) (Kemp,1998: 127). অনুরূপভাবে হেনরী ডব্লিউ আর্ট ও অন্যান্য সম্পাদিত *The Dictionary of Ecology and Environmental Science (1993)* -এ বলা হয়েছে, পরিবেশ হলো: "The whole sum of the surrounding external conditions within which an organism, a community, or an object exists" (Art, 1993: 187). অতএব, পরিবেশ হল প্রাকৃতিক জগতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জীবসত্তা এবং মানুষ কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামো যা জীবনের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এককথায় জীবসত্তা এবং তার পারিপার্শ্বিকতাই পরিবেশ। বৃহত্তর দৃষ্টিতে পরিবেশ দু'ভাগে বিভক্ত-প্রাকৃতিক (natural) এবং সামাজিক (social) পরিবেশ। অবশ্য বর্তমান আলোচনায় 'পরিবেশ' প্রত্যয়টি 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথিবীর বুকে সকল জীবনের বেঁচে থাকাকে সম্ভব করে তোলে। এর রয়েছে নিম্নোক্ত চারটি অংশ যেমন- বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল ও জীবমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল (atmosphere): বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে এমন সব গ্যাসের মিশ্রণ। যেমন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ড্রাই-অক্সাইড প্রভৃতি; বারিমণ্ডল (hydrosphere) : বারিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান জলরাশি। যেমন- সাগর, নদী, ভূগর্ভস্থ পানি প্রভৃতি; অশ্মমণ্ডল (lithosphere) পৃথিবীর উপরিভাগে বিদ্যমান দৃঢ়, শক্ত ও কঠিন বহিরাবরণ। যেমন- পাহাড়, খনিজ প্রভৃতি; জীবমণ্ডল (biosphere) পৃথিবীর সেই অংশ যেখানে প্রাণীকুল বসবাস করে। বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর এবং অশ্মমণ্ডলের উচ্চস্তর নিয়ে জীবমণ্ডল গঠিত। এটি প্রায় দুই কিলোমিটর পুরু। এর অন্তর্ভুক্ত হল মানুষ, গাছপালা, কীটপতঙ্গ এবং প্রাণীকূল প্রভৃতি (Zimmerman, 2002: 9)। প্রাকৃতিক পরিবেশ একটি বাস্তুসংস্থান (ecosystem) রূপে কাজ করে। বাস্তুসংস্থান হল একটি প্রাকৃতিক কার্যকর একক যার মধ্যে উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব এবং মানুষ প্রভৃতি মাটি, পানি, বায়ু এবং খনিজ প্রভৃতি জড় পদার্থের সাথে পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখে।

অপরদিকে সমাজ হল মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক ব্যবস্থা। মানুষ তার চাহিদা ও সুযোগ পূরণের জন্য যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তাই সামাজিক পরিবেশ। অধিকন্তু সামাজিক পরিবেশ মানুষের তৈরী সকল অবকাঠামো, দক্ষতা, জ্ঞান ও কৌশল, উৎপাদন পরিবার, কমিউনিটি, ধর্ম, মূল্যবোধ, প্রথা, রীতিনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, প্রশাসন এবং রাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে গঠিত। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কেননা সামাজিক পরিবেশে সংগঠিত কর্মকাণ্ড প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর গভীর

প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সামাজিক পরিবেশে যদি ভোগ, বিলাসিতা, দুর্নীতি, দারিদ্র্য বৈষম্য বিরাজমান থাকে তাহলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা এবং বিপর্যয় আবার সামাজিক পরিবেশে মানুষের জীবন ধারণকে অসম্ভব করে তোলে। সামাজিক পরিবেশের বহু কার্যক্রম প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে বহুবিধ পরিবেশগত সমস্যা।

পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশ একটি সমন্বিত বিষয়। অথচ শিল্পবিপ্লবের সাথে সাথে পৃথিবীর অবয়ব, বায়ুমণ্ডল এবং এর জলরাশির ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং প্রযুক্তির বিকাশের পাশাপাশি অদূরদর্শী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ পরিবেশের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে যা সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত বিপর্যয় এবং প্রাণীকুলের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সামাজিক পরিবেশ যার বাইরের কোন বিষয় নয়। নিম্নে সাম্প্রতিক বিশ্বের সার্বিক পরিবেশগত কিছু সমস্যা সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা (increasing population): বৈশ্বিক পরিবেশের অন্যতম একটি সমস্যা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জাতিসংঘের মতে, ১৯৯৪ সালের পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ৫.৬৩ বিলিয়ন যা ২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.২৩ বিলিয়ন হয়। ২০২৫ সালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৮.৪৭ বিলিয়ন (Zimmerman, 2002: 6)। তবে উন্নত দেশ অপেক্ষা উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে পৃথিবী একসময় মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

২. গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়া (greenhouse effect): ক্ষুদ্র তরঙ্গের সূর্যরশ্মি বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং ভূমির উপরিভাগ দ্বারা শোষিত হয়। আবার সূর্যরশ্মির বিকিরণের অধিকাংশই নির্গত হয়ে অবলোহিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে (infrared wavelengths) ফিরে যায়। কিন্তু তা পুনরায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ওজোন প্রভৃতি গ্যাসের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়, এগুলো গ্রীনহাউজ গ্যাস নামে পরিচিত। কিন্তু মানুষের অদূরদর্শী কর্মকাণ্ড তথা বৃক্ষনিধন, জীবাশ্ম জ্বালানীর সীমাহীন ব্যবহার এবং দূষণের ফলে গ্রীনহাউজ গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবেশগত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (Bynoe, 1998: 11)।

৩. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (global warming): পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি অন্যতম একটি পরিবেশগত সমস্যা। এর কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে জীবাশ্ম জ্বালানী যেমন-কাঠ, কয়লা, তেল, পেট্রোল প্রভৃতি অতিরিক্ত ব্যবহার এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে তৈরী গ্রীনহাউজ গ্যাস যেমন-কার্বন-ড্রাই অক্সাইড, মিথেন, সিএফসি প্রভৃতির ঘনত্ব বৃদ্ধি। ১৮৫০ সাল থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা গড়ে ১° সেন্টিগ্রেড (১.৮০ ফাঃ) বৃদ্ধি পায় (Leggett, 1990: 8)। এর ফলে মরু অঞ্চলে বরফের গলন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটছে যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

৪. অম্ল বৃষ্টি (acid rain): অম্ল বৃষ্টি বৃষ্টি ও জীবাশ্ম জ্বালানীর সাথে জড়িত। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র এবং যানবাহন থেকে সালফার ড্রাই-অক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হয় যা সূর্যরশ্মি, আর্দ্রতা ও অক্সিডেন্ট এর সাথে বিক্রিয়ায় মাধ্যমে সালিফিউরিক এবং নাইট্রেড তৈরী করে যা বায়ুমণ্ডলের প্রবাহের দ্বারা বাহিত হয়ে বৃষ্টি, তুষারপাত এবং শুকনো আস্তরণ হিসেবে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটি অম্ল বৃষ্টি নামে পরিচিত। অম্ল বৃষ্টির ফলে ধাতুর ক্ষয়, প্রস্তর নির্মিত ভবন এবং স্মৃতিস্তম্ভের ক্ষয়, প্রাণীকুলের মৃত্যু এবং হ্রদ, ঝরণা এবং মাটির অম্লতা বৃদ্ধি পায় (Loggett, 1990: 19)।

৫. ওজোন স্তরের ক্ষয় (ozone destruction): ওজোন স্তর বায়ুমণ্ডলের এমন একটি স্তর যা পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি হতে রক্ষা করে। প্রায় ৪০ কি. মি. পুরু এই স্তর ব্যতীত কোন প্রাণীর পক্ষেই পৃথিবীর বুকে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন যা রেফ্রিজারেটর, শিতাতপ নিয়ন্ত্রক, পরিষ্কারক যন্ত্র, প্যাকেট তৈরীর উপাদান, কীটনাশক ছিটানোর যন্ত্রের মাধ্যমে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ওজোন স্তরের ক্ষতি করছে। এর ফলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করছে যা চামড়ার ক্যান্সার, চোখের ছানিপড়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি এবং মহাসাগরের উদ্ভিদকণার বৃদ্ধিকে ব্যাহত করছে। (Madar,1998: 478)।

৬. বিকিরণ (radiation): যদিও বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ অধিকাংশ দেশ কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে তথাপি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের বর্জ্য এবং পারমাণবিক দুর্ঘটনার মাধ্যমে (চেরনোবিল ১৯৮৬) পারমাণবিক বিকিরণ বায়ু এবং পানি দূষণের মাধ্যমে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। পারমাণবিক বর্জ্য রকমভেদে ৭০০ থেকে ১ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকতে পারে যা পরিবেশের সুদূরপ্রসারী ক্ষতিসাধন করতে পারে (Bynoe, 1998: 14)।

৭. বৃক্ষনিধন (deforestation): কোন দেশের মোট আয়তনের শতকরা পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নের নামে নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং আমাজান নদীর তীরবর্তী বনভূমি কাঠ সংগ্রহ, শষ্যক্ষেত্র এবং পশুচারণ ক্ষেত্র নির্মাণ, জ্বালানী এবং আবাসনের জন্য ব্যাপকহারে ধ্বংস করা হচ্ছে। ১৯৮০ এর দশকে এই অঞ্চলে প্রতি মিনেটে ৫০ একর বনভূমি নিধন করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে ভূ-উপগ্রহের তথ্য অনুযায়ী আমাজান অববাহিকায় প্রায় ৫ হাজার বর্গকিলোমিটার বনভূমি ধ্বংস করা হয়। এর ফলে সাত লক্ষ প্রাণী ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। (Bynoe, 1998: 14)

৮. বায়ুদূষণ (air pollution): শিল্প এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন রাসায়নিক এবং সুক্ষ্ম উপকরণ যেমন-কার্বন, সালফার, নাইট্রোজেনের মিশ্রনের ফলে বায়ুদূষণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে নগর অঞ্চলে মোটরযান হতে নির্গত ধোঁয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাতাসে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় যা মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আবার সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইডের মিশ্রণের ফলে বায়ুমণ্ডলে সালফিরউরিক এসিডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং অম্ল বৃষ্টি তৈরী হয়।

৯. পানিদূষণ (water pollution): জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেচ এবং শিল্পের প্রয়োজনে মানুষের পানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি রাসায়নিক সার, শিল্প বর্জ্য প্রভৃতির মাধ্যমে পানিদূষণ হচ্ছে। পৃথিবীর ৭৫ শতাংশ গ্রামীণ জনগণ এবং ২০ শতাংশ নগর জনগোষ্ঠীর কোন বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। অনেক অঞ্চলেই পানিতে ক্ষতিকর বিষক্রিয়া (যেমন-আর্সেনিক) বিদ্যমান। প্রতিবছর বিশ্বের প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষ পানিবাহিত রোগে মৃত্যুবরণ করে (Bynoe, 1998: 15)।

১০. ভূমিক্ষয় (soil erosion): পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় প্রায় এক পঞ্চমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ ফসলী ভূমিকে বিনষ্ট করে খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং জ্বালানী সংগ্রহের জন্য বৃক্ষনিধনের ফলে ভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ফার্ম, শিল্প, শহর, নগর, মহানগর গড়ে তোলার ফলে ভূমি ক্ষয় হচ্ছে। ভূমির ক্ষয়ের কারণে ভূমি উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং মরুকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার ভূমিক্ষয় লেক এবং জলাধারের গভীরতা নষ্ট করছে (Madar,1998: 482)।

উপর্যুক্ত বৈশ্বিক পরিবেশগত সমস্যা ও ইস্যুগুলোর পাশাপাশি রয়েছে ফসলের মাঠে কীটনাশকের ব্যবহার এবং এর ফলে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, পরিবেশগত শরণার্থী (environmental refugee) সমস্যা, মানুষ কর্তৃক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহে বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃত্রিম মরুকরণ, জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি প্রভৃতি (Begum, 1988: 4)।

কোন অঞ্চল, দেশ, জাতি, নগর, মহানগর, কমিউনিটি এবং গৃহস্থালী কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত সমস্যা ক্রমশ তীব্রতর হয়েছে। জাপান ভিত্তিক ইনষ্টিটিউট ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ষ্ট্রাটেজিস-এর গবেষক ডঃ হরি শ্রীনিবাস পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে একটি পরিবেশগত সমস্যার স্কেল প্রদান করেন। তাঁর মতে, এই স্কেল যথাযথ ক্ষেত্রে পরিবেশগত সমস্যার কারণ অনুসন্ধান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহল সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য সুষ্ঠু নীতি কৌশল গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে (Srinivas, 2002:11)।

টেবিল-১ : শ্রীনিবাস প্রদত্ত পরিবেশগত সমস্যার স্কেল

Water Pollution	Loss of habitat, biodiversity and species endangered	**Region/ Nation**	Soil erosion and increased salinity	Toxic run-off And acid rain
Amenity loss	Traffic congestion	**City**	Loss of heritage and historical buildings	Reduced property and building values
Flooding and surface drainage	Polluted land	**Community**	Inappropriate and inadequate technology use	Inadequate tax/financial revenues
Toxic and hazardous wastes/dump	Trash dumping	**Household** Household health, garbage generation, air/water/noise pollution, spread of diseases	Lack of understanding of environmental problems	Inappropriate laws and legislation
	flooding	Noise pollution	Natural Disasters	High living densities
Loss of agricultural land and desertification	Air pollution	Water Pollution	Inadequate supply and transmission loss of electricity	Misguided urban governments and management practices
Natural and man-made hazards and disasters		Land clearance and loss of forest cover		Effects of climate change and global worming

Source: Srinivas, 2002: 11

সুনির্দিষ্ট প্রতিটি স্কেল সমস্যার সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সেবাকেও নির্দেশ করে। পরিবেশগত সমস্যাকে সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে যথার্যভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে শ্রীনিবাসের স্কেলটি গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্ট স্কেলকে বিবেচনার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চিহ্নিত হয়:

- "Health impacts are greater and more immediate at the household or community level and tend to diminish in intensity as the spatial scale increases;
- Equity issues arise in relation to (a) the provision of basic services at the household or community scale and (b) intemporal externalities ate the regional and global scale particularly the intergenerational impacts implicit in non-sustainable resource use are global environmental issues; and
- Levels of responsibility and decision making should correspond to the scale of impact, but existing jurisdictional arrangements often violate this principle" (Srinivas, 2002:11)।

টেক্সই উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত

বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, জাতীয়, নগর, কমিউনিটি এবং গৃহস্থালীর পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষাপটে পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। মূলত মানুষের ক্রমবর্ধমান

চাহিদাসমূহ পূরণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশের যে বিপর্যয় তা পরিবেশ ও উন্নয়ন বিতর্ককে জোরদার করে। বিশেষ করে অনবায়নযোগ্য সম্পদ (non-renewable resources) যেমন: তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি ক্রমশ নিঃশেষ হবার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের বিকশিত হয় এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়।

পরিবেশের অবক্ষয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা উন্নয়ন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। যেভাবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের পথ অন্বেষণ করা জরুরী। কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়নের তত্ত্ব ও প্রয়াস আমাদের কাঙ্ক্ষিত চিত্র তুলে ধরে না। সাধারণত উন্নয়নের লক্ষ্য হল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা যার নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে:

- "To increase the availability and widen the distribution of basic life sustaining goods such as food, shelter, health, and protection;
- To raise levels of living including in addition to higher income, the provision of more jobs, better education and greater attention to cultural and humanistic values, all of which will serve not only to enhance materials well-being but also to generate greater individual and national self-esteem;

- To expand the range of economic and social choices available to individuals and nations but freeing them form servitude and dependence not only in relation to other people and nation states but also to the forces of ignorance and human misery" (Todaro, 1985: 47)।

মিশেল পি টোডারো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর *Econonomic Development in the Third World (1985)* পুস্তকে বলেন, সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হল অসহায় মানুষের জন্য খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের অসহায়ত্ব দূর করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ করা, অসমতা এবং দারিদ্র্য দূর করা। (Todaro, 1985: 85) প্রকৃত পক্ষে, উন্নয়নের প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক তত্ত্ব মুক্তবাজার এবং চুইয়ে পড়া (trickle down effect) নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটি দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন চর্চায় ব্যবহৃতও হয়। কিন্তু আশানুরূপ ফল দিতে ব্যর্থ হয়। অধিকন্তু প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বিপর্যয়কর উপাদানসমূহকে বিবেচনায় আনা হয়নি। তবে প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেনি। বরং পরিবেশগত বিপর্যয়ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। আবার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ ও সরকারকে সম্ভাব্য আয় থেকে বঞ্চিত করেছে। এভাবে পরিবেশের ব্যাপক বিপর্যয় দীর্ঘ মেয়াদীভাবে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের প্রয়াসকে ব্যাহত করছে। এর ফলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে পরিবেশের ইস্যুগুলো অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ বিবেচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে যা পরিবেশ সহায়ক টেকসই উন্নয়নের ধারণা নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য মানুষের প্রচেষ্টা পূর্বেও পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালে জর্জ পারফিন্স মার্শ তাঁর *Man and Nature (1864)* পুস্তকে বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি আহবান জানান। পারফিন্স মার্শ গুরুত্ব আরোপ করেন যে, মানুষ পরিবেশের দুভার্গ্যজনক স্থায়ী পরিবর্তন সাধন করছে। তাই বিপর্যস্ত পরিবেশকে প্রাকৃতিক উপায়ে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন কার্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। তবে ১৯৩০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত চাষাবাদ ও অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক ভূমি ক্ষয় সাধন হয় এবং ১৯৫৩ সালে জাপানের মিনিমাতা বে ট্রাজেডীর ফলে নদীতে পারদ বিষক্রিয়ায় মাধ্যমে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় (Bynoe,1998: 2)। ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক গুরুত্ব পেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী রাসেল কারসন তাঁর *Silent Spring (1962)* শীর্ষক গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেন যে, মরুভূমি বা বনভূমির কোথাও দূষণমুক্ত নয়।

১৯৭২ সালে এমআইটি এর বিজ্ঞানীগণ *The Limits to Growth (1972)* শীর্ষক রিপোর্টে পরিবেশের ক্ষতি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ করার আহবান জানান। অতপর ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে জাতিসংঘের মানব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে মার্কিন সরকার প্রণীত *The Global 2000 Report (1980)* হবার পর জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৮৪ সালে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে দ্যা ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভাইরনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট গঠিত হয়। কমিশন ১৯৮৭ সালে *Our Common Future (1987)* শীর্ষক রিপোর্টে পরিবেশ সহায়ক টেকসই উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। পাশাপাশি ১৯৯২ সালের ব্রাজিলের রিওডিজেনিরোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ধরিত্রী সম্মেলন এবং ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের বিশ্বসম্মেলনে পরিবেশ ও উন্নয়নের সমন্বয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বের প্রশ্নে টেকসই উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

টেকসই উন্নয়ন : অর্থ ও বৈশিষ্ট্য

টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি সর্বপ্রথম ঐসকল অর্থনীতিবিদ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় যাঁরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক উন্নয়ন উদ্যোগে পরিবেশগত বিষয়াদিকে বিবেচনায় এনেছেন। প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রিক এই সকল উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুফল লাভ করা। আর যা ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি সীমতি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পন্থা। কিন্তু ১৯৮০ -এর দশকে টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি বহুমাত্রিকতা লাভ করে।

মূলত ১৯৮০ এর দশকে উন্নয়ন সংস্থা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে উন্নয়নের কর্মকাণ্ড সমালোচিত হতে থাকে। তাঁদের মতে বিদ্যমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যোগে টেকসই হয়নি কারণ সেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ ও সেবাসমূহকে বিবেচনায় আনা হয়নি। বস্তুত এরূপ উন্নয়ন বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের দারিদ্র্যের অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে মানব সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। উন্নয়নের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দু'টি মৌলিক উপাদান রয়েছে যা পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি হতে স্বতন্ত্র :

১. আর্থ-সামাজিক উপাদান (socio economic aspects): এর অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং মানুষের চাহিদাগুলো পূরণ করা;
২. পরিবেশগত উপাদান (environmental aspects): এর অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবকে পরিবেশের সামর্থ্যের মাঝে নিয়ে আসা (Bynoe, 1998: 10)।

দৃশ্যত টেকসই উন্নয়নের ধারণাটি উন্নয়ন ডিসকোর্সে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। কেননা পরিবেশের ওপর উন্নয়নের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ ও উন্নয়নের সমন্বয় জরুরী হয়ে পড়েছিল। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সংস্থা ও তাত্ত্বিকগণ কর্তৃক টেকসই উন্নয়নের বহুমাত্রিক সংজ্ঞা ও পদ্ধতি প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার এন্ড নেচারাল রিসোর্সেস (IUCN), জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এবং দ্যা ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফান্ড (WWF) কর্তৃক World Conservation Strategy (1980) প্রকাশিত হয় যাতে তারা বাস্তুসংস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গিতে টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেন। তাঁদের মতে টেকসই উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

- To maintain essential ecological processes and life support systems;
- To preserve genetic diversity;
- To sustain utilisation of species and ecosystems (Bynoe,1998: 10)।

এ দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে পক্ষপাতিত্বমূলকভাবে শুধুমাত্র পরিবেশগত বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকলেও আমরা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদানকে অবহেলা করতে পারি না। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও টেকসই হয় না যদি উন্নয়ন নীতিতে সম্পদ আহরণের কৌশলের পরিবর্তন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে লাভ লোকসানকে বিবেচনা না করা হয়।

উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এখানে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বিদ্যমান থাকায় অবশ্যই পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হবে এবং উন্নত জীবনের জন্য সুযোগের গণতন্ত্রায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৩ সালে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রান্ডল্যান্ডকে সভাপতি করে গঠিত দ্যা ওয়ার্ল্ড কমিশন অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট তাঁদের *Our Common Future (1987)* শীর্ষক রিপোর্টে টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে বলেন : Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (WCED,1987: 43)।

কমিশনের রিপোর্টে গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে, পরিবেশ ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো স্বতন্ত্র নয় বরং সম্পর্কযুক্ত। উন্নয়ন অবনতিশীল সম্পদের ওপর ভিত্তি করে চলতে পারে না, আবার পরিবেশকেও সংরক্ষণ করা যায় না যখন উন্নয়নের পদক্ষেপে পরিবেশগত বিপর্যয়কে উপেক্ষা করা হয়। কার্যত টেকসই উন্নয়নের সাথে দুটি মৌল ধারণা সম্পৃক্ত :

- "The concepts of '*needs*': the concepts of needs, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and

- The idea of '*limitations*': the idea a limitations imposed by the state of technology and social organization on the environments ability to meet present and future needs"(WCED,1987: 43) ।

টেকসই উন্নয়নের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নির্ধারণের পাশাপাশি কমিশন পরিবেশ সহায়ক উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়নের নীতিসমূহের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাতটি কৌশল নিধারণ করেন যা নিম্নরূপ :

- Riviving growth;
- Changing the quality of growth;
- Meeting essential needs for jobs, food, energy, water and sanitation;
- Ensuring a sustainable level of population;
- Conserving and enhancing the resources base;
- Reorienting technology and managing risk; and
- Merging environment and economics in decision making (WCED, 1987: 43)

এর পাশাপাশি উন্নয়ন ও পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও তাত্ত্বিকগণও টেকসই উন্নয়নকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আর পেপেটো টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন, টেকসই হবার মৌল অর্থ হল বর্তমান সিদ্ধান্তগুলো যেন ভবিষ্যতের জীবনমান পরিচালনা অথবা উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন না করে। এটা বোঝায় যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এভাবে পরিচালিত হবে যার মাধ্যমে আমরা সম্পদের অংশীদারিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি (WCED,1987: 44) । একইভাবে ডি পিয়ার্স টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে বলেন, টেকসই উন্নয়ন হলো :

- Development subject to a set of constraints which set resource harvest rates at levels not higher than managed natural regeneration rate ; and
- Use of the environment as a "waste sink" on the basis that waste disposal rate should not exceed rates of managed or natural assimilative capacity of the ecosystem (Jalal, 2003: 1) ।

এম. মুনাসিংহে এবং ই. লুজ ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ সংক্রান্ত বিয়াল্লিশ নং কার্যপুস্তিকায় বলেন, টেকসই উন্নয়ন এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা জীবনযাত্রার মানের ক্রমবর্ধমান অগ্রতির পাশাপাশি সম্পদের সীমিত ব্যবহারকে অনুমোদন করে, যাতে করে আগামী প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ও বস্তুগত সম্পদ মজুদ বা বৃদ্ধি করা যায়। একইভাবে ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন (১৯৯৩) টেকসই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে বলেন :

> "Sustainable development means achieving a quality of life which is socially desirable, economically viable, and ecologically sustainable that can be maintained for many generations" (Jalal, 2003: 2)

আবার বিশ্বব্যাংক তাঁদের *World Development Report (1992)* -এ বলেন টেকসই উন্নয়ন হল লাভ-ক্ষতির পর্যালোচনা ও সতর্ক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উন্নয়ন এবং পরিবেশগত নীতি প্রণয়ন যা পরিবেশ সংরক্ষণকে জোরদার করবে, এবং কল্যাণকে আরও এগিয়ে নেওয়া ও টেকসই করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে (Jalal, 2003: 3) ।

অপরদিকে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে The Rio Declaration on Environment and Development (১৯৯২) শীর্ষক ঘোষণায় টেকসই উন্নয়নের সাতাশটি নীতি ঘোষণা করা হয় (UN,1992: 2) । এ ঘোষণার চতুর্থ

নীতিতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় : "In order to achieve sustainable development, environmental protection should constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it" (UN,1992: 2) ।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাগুলো বিশ্লেষণ করলে টেকসই উন্নয়নের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । টেকসই উন্নয়ন পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের একটি ক্রমিক প্রক্রিয়া; এটি আঞ্চলিক, জাতীয়, স্থানীয়, নৃতাত্ত্বিক, এবং সাংস্কৃতিক বিবেচনা করে; এতে উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়; এটি প্রকৃতির সাথে ঐক্য ও সহাবস্থানকে নির্দেশ করে এবং টেকসই উন্নয়নে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় ।

উপসংহার

টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট যে, সুষ্ঠু ও নির্মল পরিবেশ মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য । অথচ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, গ্রীণহাউজ প্রতিক্রিয়া, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, অম্লবৃষ্টি, ওজোন স্তরের ক্ষতি, বিকিরণ, বৃক্ষনিধন, বায়ুদূষণ, শব্দ দূষণ, ভূমি ক্ষয় প্রভৃতি সমস্যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে । পরিবেশর ক্ষতি সাধন করে উন্নয়ন করা হলে তা হবে ধংসাত্মক । এর অর্থ এই নয় যে মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে যাওয়া । বরং উন্নয়নের ধারাকে বংশ পরম্পরায় চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক, যৌক্তিক ও সতর্ক ব্যবহারই টেকসই উন্নয়নের মৌল প্রস্তাবনা । এ কথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের ভোগ ও বিলাসে নিবেদিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি দায়ভার আছে যা চূড়ান্ত বিচারে পরিবেশ বিশেষত প্রাকৃতিক পরিবেশকেই বহন করতে হয় । তাই সতর্ক পদক্ষেপই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণে সহায়ক হতে পারে । বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহের মানুষের নিরাপদ ও সমৃদ্ধ জীবন যাত্রার জন্য ইতোমধ্যেই পরিবেশকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে । উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহ যেখানে উন্নয়ন এখনো ধীর গতিসম্পন্ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে ব্যবহৃত হয়নি সেখানে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর কথা বিবেচনায় এনে প্রাকৃতিক সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে । এ-জন্য টেকসই উন্নয়নের ধারণাটির প্রসারের পাশাপাশি উন্নয়ন প্রত্যাশী সরকার, ব্যক্তিখাত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সিভিল সোসাইটির মধ্যে পরবর্তী বংশধরদের জন্য আবাসযোগ্য ধরণী নির্মাণের জন্য ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা জরুরী ।

তথ্য নির্দেশিকা

Art, Henry W. et.al. (eds.). 1993. The Dictionary of Ecology and Environmental science, New York: Henry Holt and Company.

Begum, Khurshida, 1998. Tension Over Farakka Barrage: A Techno-Political Trangle in South Asia, Stuttgart: Steiner Verlag Wiesbaden GmbH.

International Labour Organization. 1976. Employment, Growth and Basic Needs: A One World Approach, Geneva: ILO.

Kemp, David D. 1998. The Environment Dictionary, New York: Routledge.

Leggett, Jeremy (ed.). 1990. Global Warming: The Greenpeace Report, New york: Oxford University Press.

McGraw-Hill, 1992. McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, New York: McGraw-Hill.

Madar, Silvia S. 1998. Biology, New York:WBC/ Mc Graw-Hill.

MacIver, R. M. and Page, C. H. 1972. Society: An Introductory Analysis, London: Oxford University Press.

Meadows, D. H. et.al. 1992. Beyonds the Limits, London: Earthscan.

Rostow, W. W. 1960. The Stage of Economic Growth, New Haven: Yeal Press.

Srinivas, Hari. 2002. "Environment", e-Learn for Sustainable Development, Tokyo: Institute for Global Environmental Studies.

Todaro, Michael P. (ed.). 1985. Economic Development in the Third World, New York: Longman.

United Nations, The Rio Declaration on Enviornment & Development, 1992, Rio Henereo:UN.

World Commission for Environment and Development. 1987. Our Common Future, New York: Oxford University Press.

Zimmerman, Michael. 2002. "Environment", Microsoft Encarta Encyclopedia, New York: Microsoft Corporation.